"হ্যাঁ। বেটা মদ খেয়ে এসেছে সেই জন্যে! তুমি কি মদ খেয়েছ?"

"মদ?"

"হ্যাঁ। ইথাইল অ্যালকোহল হচ্ছে মদ। এই মশা রক্ত না খেয়ে এখন মদ খাওয়া শিখেছে। আক্কাসের রক্তে ইথাইল অ্যালকোহল, সেজন্যে ওকে ধরেছে।"

আমি বললাম, "আমাকে ধরবে না?"

"না। তুমি যদি ইথাইল অ্যালকোহল—সোজা বাংলায় মদ খেয়ে না থাক তা হলে তোমাকে ধরবে না।"

আমি বললাম, "আমি মদ খেতে যাব কোন দুঃখে?"

"তা হলে তোমার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নাই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখ।"

আমি তখন দেখলাম কালো মেঘের মতো লাখ লাখ মশা একসাথে ছুটে যাচ্ছে! সেটা একটা দেখার মতো দৃশ্য। না জানি এখন কোন মদ খাওয়া মানুষকে ধরবে। আমি বুকের ভেতর থেকে একটা নিশ্বাস ছেড়ে দিয়ে চোখ বড় বড় করে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলাম। মশাগুলো তখন দক্ষিণ দিকে উড়ে যাচ্ছে, দেখে মনে হল একটা মেঘ বুঝি ভেসে যাচ্ছে।

পরদিন খবরের কাগজে খুব বড় বড় করে আক্কাস আকন্দের খবরটা ছাপা হয়েছিল। তার শরীরের ছিবড়েটা তখনই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে তাকে নাকি দশ বোতল রক্ত দিতে হয়েছে! এতগুলো সাংবাদিককে ডেকে এনে এরকম ভাঁওতাবাজি করার জন্যে সাংবাদিকরা খুব খেপে পত্রিকাগুলোতে একেবারে যাচ্ছেতাইভাবে আক্কাস আকন্দকে গালাগাল করেছে। শুধু যে গালাগাল করেছে তা না, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নাকি এতগুলো মশা শহরে ছেড়ে দেবার জন্যে আক্কাস আকন্দের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করে দেবে। বাছাধনের বারোটা বেজে যাবে তখন।

পত্রিকার বড় বড় খবর নিয়ে সবাই যখন মাথা ঘামাচ্ছে তখন ভেতরের পাতার একটা খবর কেউ সেভাবে খেয়াল করে নি। এক রগচটা কাঠমোল্লা একটা গির্জা ঘেরাও করার জন্যে তার দলবল নিয়ে রওনা দিয়েছিল, রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে সে যখন সবাইকে উসকে দেবার জন্য গরম গরম বক্তৃতা দিচ্ছে তখন হঠাৎ কোথা থেকে হাজার হাজার মশা এসে তাকে আক্রমণ করেছে। প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বেঁচেছে সেই রগচটা কাঠমোল্লা—

এত মানুষ থাকতে তাকেই কেন মশা আক্রমণ করল কেউ সেটা বুঝতে পারছে না। বুঝতে পেরেছি খালি আমি আর অনিক।

ইঁদুর

ঘুমে আমার চোখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, অনেক কষ্টে সেটা খোলা রেখেছি কিন্তু আর বেশিক্ষণ সেটা করতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। আমি অন্তত এক শ বার অনিককে বলেছি যে আমি বিজ্ঞানের কিছু বুঝি না, খামাকা আমাকে এসব বোঝানোর চেষ্টা করে লাভ নাই—কিন্তু বিষয়টা এখনো

অনিকের মাথায় ঢোকাতে পারি নাই। যখনই তার মাথায় বিজ্ঞানের নতুন একটা আবিষ্কার কুটকুট করতে থাকে তখনই সেটা আমাকে শোনানোর চেষ্টা করে। আজকে যে রকম সে আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করছে কালবৈশাখীর সময় যে বজ্রপাত হয় সেই বজ্রপাতের বিদ্যুৎটা কীভাবে ক্যাপাসিটর না কী এক বস্তুর মাঝে জমা করে রাখবে। বিষয়টা এক কান দিয়ে ঢুকে আমার অন্য কান দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছিল। অনিক যেন সেটা বুঝতে না পারে সেজন্যে আমি চোখে-মুখে একটা কৌতূহলী ভাব ফুটিয়ে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম কিন্তু মনে হচ্ছে আর পারা যাচ্ছে না। চোখে-মুখে কৌতূহলী ভাব নিয়েই মনে হয় আমি ঘুমে ঢলে পড়ব।

আমার কপাল ভালো, ঠিক এরকম সময় অনিক থেমে গিয়ে বলল, "এক কাপ চা খেলে কেমন হয়?"

আমি বললাম, "ফার্স্ট ক্লাস আইডিয়া!"

"রঙ চা খেতে হবে কিন্তু।" অনিক বলল, "বাসায় দুধ নাই।"

আমি বললাম, "রঙ চা-ই ভালো।"

অনিক একটু ইতস্তত করে বলল, "চিনিও মনে হয় নাই। খোঁজাখুঁজি করে একটা ক্যামিকেল বের করতে পারি যেটা একটু মিষ্টি মিষ্টি হতে পারে—"

চিনি নাই শুনে আমি একটু দমে গেলাম কিন্তু তাই বলে কোনো একটা ক্যামিকেল খেতে রাজি হলাম না। বললাম, "কিছু দরকার নেই চিনির। চিনি ছাড়াই চা খাব।"

অনিক তার রান্নাঘরে গিয়ে খানিকক্ষণ খুটুর মুটুর শব্দ করে বাইরে এসে বলল, "চা পাতাও তো দেখি না। খালি গরম পানি খাবে, জাফর ইকবাল?"

এবারে আমি বিদ্রোহ ঘোষণা করলাম। বললাম, "তার চাইতে চলো মোড়ের দোকান থেকে চা খেয়ে আসি।"

অনিক বলল, "আইডিয়াটা খারাপ না। তা হলে চায়ের সাথে অন্য কিছুও খাওয়া যাবে।"

তাই আমি আর অনিক বাসা থেকে বের হলাম। অনিকের বাসার রাস্তা পার হয়ে মোড়ে ছোট একটা চায়ের দোকান, সময়-অসময় নেই সব সময়েই এখানে মানুষের ভিড়। আমরা দুইজন খুঁজে একটা খালি টেবিল বের করে বসে চায়ের অর্ডার দিয়েছি। অনিক টেবিল থেকে পুরোনো একটা খবরের কাগজ তুলে সেখানে চোখ বুলাতে বুলাতে বলল, "চা একটা অদ্ভুত জিনিস! কোথাকার কোন গাছের পাতা শুকিয়ে সেটা গরম পানিতে দিয়ে রঙ করে সেটাতে দুধ চিনি দিয়ে মানুষ খায়। কী আশ্চর্য!"

আমি বললাম, "মানুষ খায় না এমন জিনিস আছে? কোনো দিন চিন্তা করেছ জন্তু-জানোয়ারের নিচে লটরপটর করে ঝুলে থাকে যেসব জিনিস সেটা টিপে যে রস বের হয় সেটা খায়?"

অনিক অবাক হয়ে বলল, "সেটা আবার কী?"

"দুধ! গরুর দুধ!"

অনিক হা হা করে বলল, "সেভাবে চিন্তা করলে মধু জিনিসটা কী কখনো চিন্তা করেছ? পোকামাকড়ের পেট থেকে বের হওয়া আঠা আঠা তরল পদার্থ।"

আমি আরেকটা কী বলতে যাচ্ছিলাম ঠিক তখন পাশের টেবিল থেকে একটা ক্রুদ্ধ গর্জন শুনতে পেলাম। মাথা ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখি কমবয়সী মাস্তান ধরনের একজন একটা চায়ের কাপ হাতে নিয়ে চিৎকার করছে। তার সামনে রেস্টুরেন্টের বয় ছেলেটি ফ্যাকাসে মুখে দাঁড়িয়ে আছে। মাস্তান হুংকার দিয়ে বলল, "তোরে আমি কতবার কইছি চায়ে চিনি কম?"

ছেলেটি ভয়ে কোনো কথা বলল না। মাস্তান টেবিলে কিল দিয়ে বলল, "আর তুই হারামির বাচ্চা শরবত বানায় আনছস? আমার সাথে রংবাজি করস?"

টেবিলে তার সামনে বসে থাকা আরেকজন মাস্তান সমান জোরে হুংকার দিয়ে বলল, "কথা বাড়ায়া লাভ নাই বিল্লাল ভাই। হারামজাদার মাথায় ঢালেন। শিক্ষা হউক—"

প্রথম মাস্তান, যার নাম সম্ভবত বিল্লাল, মনে হল প্রস্তাবটা শুনে খুশি হল। মাথা নেড়ে বলল, "কথা তুই মন্দ বলিস নাই।" তারপর রেস্টুরেন্টের বয় ছেলেটার শার্টের কলার ধরে টেনে নিজের কাছে নিয়ে এসে কাপটা তার মাথার ওপর ধরল। চায়ের কাপটা থেকে গরম চা মনে হয় সত্যি ঢেলেই দিত কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে অনিক লাফিয়ে চায়ের কাপটা ধরে ফেলল। মাস্তানের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনার মাথা খারাপ হয়েছে?"

বিল্লাল মাস্তান একটু অবাক হয়ে অনিকের দিকে তাকাল। বলল, "আপনে কেডা?"

অনিক বলল, "আমি যেই হই না কেন—তাতে কিছু আসে যায় না। আপনি একটি ছোট বাচ্চার মাথায় গরম চা ঢালতে পারেন না।"

দুই নম্বর মাস্তান বলল, "আপনি দেখবার চান আমরা সেটা পারি কি না?"

অনিক বলল, "না সেটা দেখতে চাই না। আপনার চায়ে যদি চিনি বেশি হয়ে থাকে আপনাকে আরেক কাপ চা বানিয়ে দেবে কিন্তু সেজন্যে আপনি একটা ছোট বাচ্চার মাথায় গরম চা ঢালবেন?"

এরকম সময় রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার দুই কাপ চা, শিঙাড়া আর কয়েকটা মোগলাই পরোটা নিজের হাতে করে টেবিলে নিয়ে এসে বলল, "বিল্লাল ভাই এই যে আপনার জন্যে এনেছি। রাগ করবেন না বিল্লাল ভাই। খান। খেয়ে বলেন কেমন হইছে।"

বিল্লাল নামের মাস্তানটা গম্ভীর হয়ে বলল, "আমি কি রাগ করতে চাই? কিন্তু আপনার বেয়াদব বেয়াক্কেল বয় বেয়ারা—"

ম্যানেজার বলল, "ছোট মানুষ বুঝে নাই। আর ভুল হবে না বিল্লাল ভাই।" তারপর ছোট ছেলেটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে বলল, "যা এখান থেকে।"

দুইজন মাস্তান তখন খুব তৃপ্তি করে খেতে থাকে। খেতে খেতে দুলে দুলে হাসে যেন খুব মজা হয়েছে। দেখে আমার রাগে পিত্তি জ্বলে যায়।

মাস্তান দুইজন যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ রেস্টুরেন্টের কেউ কোনো কথা বলল না। কিন্তু তারা খেয়ে বিল শোধ না করে বের হওয়া মাত্রই সবাই কথা বলতে শুরু করল। ম্যানেজার নিচে থুতু ফেলে বলল, "আল্লাহ্‌র গজব পড়ুক তোদের ওপর। মাথার ওপর ঠাঠা পড়ুক।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কারা এরা?"

"আর বলবেন না। বারো নম্বর বাসায় উঠেছে। দুই মাস্তান। একজন বিল্লাল আরেকজন কাদির। মাস্তানির জ্বালায় আমাদের জান শেষ।"

অনিক জিজ্ঞেস করল, "এরকম মানুষকে বাড়িওয়ালা বাড়ি ভাড়া দিল কেন?"

ম্যানেজার বলল, "বাড়ি ভাড়া দিয়েছে মনে করেছেন? জোর করে ঢুকে গেছে।"

অনিক অবাক হয়ে বলল, "জোর করে ঢুকে গেছে?"

"জে।" ম্যানেজার শুকনো মুখে বলল, "বারো নম্বর বাসাটা হচ্ছে মাসুদ সাহেবের। রিটায়ার্ড স্কুল মাস্টার। অনেক কষ্ট করে দোতলা একটা বাসা করেছেন। নিচের তলা ভাড়া দিয়েছেন উপরে নিজে থাকতেন। কয়দিন আগে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেন। তার স্ত্রী বুড়ি মানুষ কিছু বুঝেন-সুঝেন না। সাদাসিধে মানুষ। তখন এই দুই মাস্তান ভাড়াটেদের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে ঢুকে গেল।"

রেস্টুরেন্টের একজন বলল, "পুরো বাড়ি দখলের মতলব।"

ম্যানেজার মাথা নাড়ল, "জে। বুড়ির কিছু হইলেই তারা বাড়ি দখল করে নিবে।"

রেস্টুরেন্টের একজন বলল, "কিছু না হইলেও দখল নিবে। এরা লোক খুব খারাপ।"

ম্যানেজার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল, "জে। বাসায় মদ গাঞ্জা ফেনসিডিল ছাড়া কোনো ব্যাপার নাই। এলাকার পরিবেশটা নষ্ট করে দিল।"

রেস্টুরেন্টে যারা চা খাচ্ছে তারাও এই এলাকাটা কীভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার বর্ণনা দিতে শুরু করল। দেখা গেল সবারই বলার মতো ছোট–বড় কোনো একটা গল্প আছে।

আমরা চা খেয়ে বের হয়ে বাসায় ফেরত আসছি তখন রাস্তার পাশে হঠাৎ করে অনিক দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল, "বারো নম্বর বাসা।"

আমিও ভালো করে তাকালাম, জরাজীর্ণ দোতলা একটা বাসা। দেখেই বোঝা যায় কোনো রিটায়ার্ড স্কুল মাস্টার তার সারা জীবনের সঞ্চয় দিয়ে কোনোভাবে দাঁড়া করিয়েছেন। বহুদিনের পুরোনো, দরজা-জানালার রঙ উঠে বিবর্ণ। পলেস্তারা খসে জায়গায় জায়গায় ইট বের হয়ে এসেছে। নিচের তলায় দরজা তালা মারা, এখানে নিশ্চয়ই বিল্লাল এবং কাদির মাস্তান থাকে। খোলা জানালা দিয়ে ভেতরে দেখা যায়, সেখানে মোটামুটি একটা হতচ্ছাড়া পরিবেশ।

আমরা ঠিক যখন হাঁটতে শুরু করেছি তখন দোতলা থেকে একটা চিৎকার শুনতে পেলাম। মহিলার গলার আওয়াজ মনে হল, কেউ বুঝি কাউকে খুন করে ফেলছে। আমি আর অনিক একজন আরেকজনের দিকে তাকালাম তারপর দুদ্দাড় করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলাম। দরজা বন্ধ। সেখানে জোরে জোরে ধাক্কা দিয়ে বললাম, "কী হয়েছে?"

আমাদের গলার আওয়াজ শুনে ভিতরের চিৎকার হঠাৎ করে থেমে গেল। আমরা আবার দরজায় ধাক্কা দিলাম। তখন ভিতর থেকে ভয় পাওয়া গলায় একজন বলল, "কে?"

অনিক বলল, "আমরা। কোনো ভয় নেই দরজা খুলেন।"

তখন খুট করে শব্দ করে দরজা খুলে গেল। বারো-তের বছর বয়সের একটা মেয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, মনে হয় বাসায় কাজকর্মে সাহায্য করে। পিছনে একটা চেয়ারের ওপরে সাদা চুলের একজন বুড়ি দাঁড়িয়ে আছে, তার চোখে-মুখে ভয়ের চিহ্ন। মনে হয় এই বুড়ি মহিলাটিই চিৎকার করেছিল। অনিক জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

বারো-তের বছরের মেয়েটি খুক খুক করে হেসে ফেলল। বলল, "নানু ভয় পাইছে।"

"কী দেখে ভয় পেয়েছেন?"

"ইন্দুর।"

ব্যাপারটা এখন আমাদের কাছে পরিষ্কার হল। যারা ইঁদুরকে ভয় পায় তারা ইঁদুর দেখে লাফিয়ে চেয়ার-টেবিলে উঠে পড়তেই পারে। ভয় খুব মারাত্মক জিনিস। গোবদা একটা মাকড়সা দেখে আমি একবার চলন্ত বাস থেকে লাফিয়ে নেমে পড়েছিলাম।

অনিক বুড়ি মহিলার কাছে গিয়ে বলল, "আপনি নামুন। কোনো ভয় নাই।"

বুড়ি মহিলা অনিকের হাতে ধরে সাবধানে নামতে নামতে রাগে গরগর করতে করতে বলল, "এত করে শিউলিরে বললাম ইঁদুর মারার বিষ কিনে আন, আমার কথা শুনতেই চায় না—"

শিউলি নিশ্চয়ই কাজের মেয়েটি হবে, সে দাঁত বের করে হেসে বলল, "আনছি নানু। কিন্তু বিষে ভেজাল আমি কী করমু? সেটা খেয়ে ইন্দুরের তেজ আরো বাড়ছে। গায়ে জোর আরো বেশি হইছে।"

বুড়ি ভদ্রমহিলা চোখ পাকিয়ে শিউলির দিকে তাকিয়ে বলল, "ঢং করিস না! ইঁদুরের বিষে আবার ভেজাল হয় কোনো দিন শুনছিস?"

শিউলি বলল, "হয় নানু হয়। আজকাল সবকিছুতে ভেজাল। সবকিছুতে দুই নম্বুরি।"

অনিক হাসিমুখে বলল, "আপনাকে যদি ইঁদুরে উৎপাত করে কোনো চিন্তা করবেন না। আমি আপনার সব ইঁদুর দূর করে দিব।"

বুড়ি এবারে ভালো করে একবার অনিকের দিকে আরেকবার আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমরা কে বাবা?"

অনিক বলল, "আমি এই পাড়াতেই থাকি।"

"তোমার কাছে ভালো ইঁদুরের বিষ আছে?"

"জি না, বিষ নেই। তবে আমি আপনার এখানে লো ফ্রিকুয়েন্সির কয়েকটা সোনিক বিপার লাগিয়ে দেব, ইঁদুর বাপ বাপ করে পালিয়ে যাবে।"

"কী লাগিয়ে দেবে?"

"সোনিক বিপার। তার মানে হচ্ছে মেকানিক্যাল অসিলেশান। আমাদের কানের রেসপন্স হচ্ছে বিশ হার্টজ থেকে বিশ কিলো হার্টজ। এই বিপার—"

আমি অনিকের হাত ধরে বললাম, "এত ডিটেইলসে বলার কোনো দরকার নেই। তুমি ছাড়া কেউ বুঝবে না। শুধু কী করতে হবে বলে দাও—"

"কিছু করতে হবে না, ঘরের কোনো এক জায়গায় রেখে দেবেন, দেখবেন পাঁচ-দশ মিটারের ভেতর কোনো ইঁদুর আসবে না। যদি থাকে বাপ বাপ করে পালাবে।"

বুড়ি ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ অনিকের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "বাবা, মাস্তানদের জন্যে এরকম একটা যন্ত্র তৈরি করতে পারবে না? যেটা লাগালে মাস্তানেরা বাপ বাপ করে পালাবে?"

শিউলি আবার হি হি করে হেসে উঠে বলল, "নানু, মাস্তানরা ইন্দুর থেকে অনেক বেশি খারাপ! তারা একবার বাড়িতে ঢুকলে কোনো যন্ত্র দিয়ে বের করা যায় না!"

অনিক কোনো কথা বলল না, একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে বলল, "প্রথমে ইঁদুর দিয়ে শুরু করি। আজকে হয়তো পারব না, কাল না হয় পরশু বিকেলে আমি আসব। এসে সোনিক বিপারগুলো লাগিয়ে দেব।"

বৃদ্ধা মহিলা বললেন, "ঠিক আছে বাবা।"

বাসায় ফিরে অনিক কাজ শুরু করে দিল। তার ওয়ার্কবেঞ্চে নানা যন্ত্রপাতি ইলেকট্রনিক সার্কিট একত্র করে কী যেন একটা তৈরি করতে লাগল। আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, "ইঁদুরের জন্যে এত যন্ত্রপাতি লাগে? আমি দেখেছি আমার মা ভাতের সাথে সেঁকো বিষ মিশিয়ে রান্নাঘরের কোনায় ফেলে রাখতেন—"

অনিক বলল, "শুধু ইঁদুর দূর করতে এত জিনিস লাগে না। আমি এই বাড়ি থেকে ছোট ইঁদুর আর বড় ইঁদুর সব দূর করতে চাই।"

"বড় ইঁদুর?" আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, "কত বড়?"

অনিক হাত তুলে বলল, "এই এত বড়!"

"এত বড় ইঁদুর হয়?"

অনিক বলল, "হয়।"

আমি তখন হঠাৎ করে বুঝতে পারলাম অনিক বিল্লাল আর কাদিরের কথা বলছে। আমি চোখ বড় বড় করে বললাম, "পারবে দূর করতে?"

অনিক গম্ভীর মুখে বলল, "দেখি।"

আমি অনিককে কাজ করতে দিয়ে বাসায় চলে এলাম।

দুদিন পর বিকাল বেলা অনিক আমাকে ফোন করল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার ইঁদুর দূর করার যন্ত্র কতদূর?"

"রেডি।"

"ছোট ইঁদুর না বড় ইঁদুর?"

"দুটোই।"

"ভেরি গুড। কখন যন্ত্রগুলো লাগাতে যাবে?"

"এখনই যাব ভাবছিলাম। তোমার কোনো কাজ না থাকলে চলে এস।"

খাওয়া এবং ঘুম ছাড়া আমার আর কখনোই কোনো কাজ থাকে না। আমি তাই সাথে সাথে রওনা দিয়ে দিলাম।

অনিকের বাসায় গিয়ে দেখি সে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমাকে দেখে একটা ব্যাগ হাতে নিয়ে বলল, "চলো যাই।"

আমি বললাম, "চলো।"

"আসার সময় বারো নম্বর বাসাটা লক্ষ করেছ?"

"হ্যাঁ। করেছি। কেন?"

"বড় ইঁদুর দুটি আছে?"

"কে? বিল্লাল আর কাদির?"

"হ্যাঁ।"

"ঘরে তালা নেই। নিশ্চয়ই আছে।"

অনিক সন্তুষ্টির ভাব করে বলল, "গুড।"

দুইজন মাস্তান বাসায় থাকলে কেন সেটা ভালো হবে আমি সেটা বুঝতে পারলাম না। পৃথিবীর বেশিরভাগ জিনিসই আমি অবিশ্যি বুঝতে পারি না, তাই আমি সেটা নিয়ে মাথা ঘামালাম না।

বারো নাম্বার বাসায় গিয়ে আমি আর অনিক যখন ধুপধাপ শব্দ করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছি তখন নিচের তলায় দরজা খুলে একজন মাস্তান বের হয়ে এল। আমরা চিনতে পারলাম, এটা বিল্লাল মাস্তান। আমাদের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে বিল্লাল মাস্তান বলল, "কে? আপনারা কোথায় যান?"

"উপর তলায়।"

"কেন?"

আমাদের ইচ্ছে হলে আমরা উপর তলা-নিচের তলা যেখানে খুশি যেতে পারি, মাস্তানের তাতে নাক গলানোর কী? আমার মেজাজ গরম হয়ে উঠল। কী একটা বলতে যাচ্ছিলাম, অনিক আমাকে থামিয়ে বলল, "উপর তলায় খুব ইঁদুরের উৎপাত তাই একটা যন্ত্র লাগাতে যাচ্ছি।"

বিল্লাল মাস্তান তখন হঠাৎ করে আমাদের দুইজনকে চিনতে পারল, চোখ বড় করে বলল, "আপনাদের আগে দেখেছি না?"

আমি মাথা নাড়লাম, "হ্যাঁ। চায়ের দোকানে—"

"বেয়াদব ছেমড়াটা যখন ডিস্টার্ব করছিল আর আমি যখন টাইট দিতে যাচ্ছিলাম তখন—"

অনিক মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ। তখন আমি আপনাকে থামিয়েছিলাম।"

বিল্লাল মাস্তান গম্ভীর মুখে বলল, "উচিত হয় নাই। বেয়াদব পোলাটার একটা শাস্তি হওয়ার দরকার ছিল।"

আমি আর অনিক কোনো কথা বললাম না। কে সত্যিকারের বেয়াদব আর কার শাস্তি হওয়া দরকার সে ব্যাপারে আমার আর অনিকের ভেতরে কোনো সন্দেহ নাই। আমরা যখন সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছি তখন বিল্লাল মাস্তান পিছু পিছু উঠে এল। বলল, "আমাদের ঘরেও ইন্দুরের উৎপাত। শালার রাত্রে ঘুমানো যায় না। আমাদের ঘরেও একটা যন্ত্র লাগায়ে দিবেন!"

"এইগুলি দামি যন্ত্র।"

"কত দাম?"

"টাকা দিয়ে তো আর দাম বলতে পারব না। অনেক গবেষণা করে বানাতে হবে। আমার কাছে বেশি নাই। একটাই আছে।"

"অ।" বিল্লাল কেমন যেন বিরস মুখে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি আর অনিক দোতলায় উঠে দরজায় ধাক্কা দিলাম। শিউলি দরজা খুলে আমাদের দেখে দাঁত বের করে হেসে বলল, "নানু ইন্দুরওয়ালারা আসছে।"

আমি আর অনিক একজন আরেকজনের দিকে তাকালাম। এই বাসায় আমাদের যে ইন্দুরওয়ালা হিসেবে একটা পরিচিতি হয়েছে সেটা জানতাম না। শিউলি যখন আমাদের পিছনে বিল্লাল মাস্তানকে দেখল তখন দপ করে তার মুখের হাসি নিবে গেল।

অনিক তার ব্যাগ থেকে গোলাকার একটা যন্ত্র বের করে বলল, "এটা একটা উঁচু জায়গায় রাখতে হবে। এমনভাবে রাখতে হবে যেন সম্পূর্ণ ঘরটা সামনে থাকে। সামনে কিছু থাকলে কিন্তু কাজ করবে না।"

বৃদ্ধ ভদ্রমহিলা বললেন, "ঐ আলমারির ওপর রেখে দেন।"

অনিক আলমারির ওপর রেখে সুইচ টিপে সেটা অন করে দিতেই একটা ছোট লাল বাতি জ্বলতে থাকল। অনিক সন্তুষ্টির ভান করে বলল, "গুড। এখন আর কোনো চিন্তা নেই। আপনার এই ঘরে কোনো ইঁদুর ঢুকবে না।"

বৃদ্ধ ভদ্রমহিলা খানিকটা সন্দেহের চোখে যন্ত্রটা দেখে বললেন, "দেখি বাবা, তোমার যন্ত্র কাজ করে কিনা।"

অনিক একটা কাগজ বের করে সেখানে তার নাম-ঠিকানা লিখে বৃদ্ধ ভদ্রমহিলার হাতে দিয়ে বলল, "যদি কোনো সমস্যা হয় শিউলিকে দিয়ে আমার কাছে খবর পাঠিয়ে দেবেন। আমি এই এক রাস্তা পরেই থাকি।"

"ঠিক আছে বাবা।"

আমরা যখন বের হয়ে এলাম তখন বিল্লাল মাস্তান আমাদের সাথে বের হয়ে এল। কিন্তু আমাদের সাথে নিচে নেমে এল না, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ঘ্যাস ঘ্যাস করে বগল চুলকাতে লাগল।

রাস্তায় নেমে আমি বললাম, "একটা বোকার মতো কাজ করেছ।"

"কী করেছি বোকার মতো?"

"এই যে বিল্লাল মাস্তানকে ইঁদুর দূর করার যন্ত্রটা দেখালে। এই মাস্তান তো এই যন্ত্র কেড়ে নিয়ে যাবে।"

অনিক আনন্দিত মুখে বলল, "তোমার তাই মনে হচ্ছে?"

"হ্যাঁ।"

অনিক মাথা নেড়ে বলল, "দেখা যাক কী হয়।"

অনিক বাসায় এসেই আমাকে ভিতরে নিয়ে গেল। অনেক যন্ত্রপাতির মাঝে একটা বড় টেলিভিশন, সুইচ টিপে সেটা অন করে দিয়ে সামনে দাঁড়াল। আমি অবাক হয়ে বললাম, "কী হল? এখন টেলিভিশন দেখবে?"

"হ্যাঁ।"

"বাংলা সিনেমা আছে নাকি?"

"দেখি বাংলা নাকি ইংরেজি।"

টেলিভিশনটা হঠাৎ করে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং সেখানে আমি একটা বিচিত্র দৃশ্য দেখতে পেলাম; স্ক্রিনে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বারো নম্বর বাসার বৃদ্ধা মহিলা এবং শিউলিকে। দুজনের চোখে-মুখে একটা ভয়ের ছাপ, কারণ কাছেই দাঁড়িয়ে আছে বিল্লাল মাস্তান। অনিক ভলিউমটা বাড়াতেই আমি তাদের কথাও শুনতে পেলাম। শিউলি বলছে, "না এটা নিয়েন না। এইটা ইন্দুরওয়ালারা নানুরে দিছে।"

বিল্লাল মাস্তান হাত তুলে বলল, "চড় মেরে দাঁত ফেলে দিব। আমার মুখের উপরে কথা?"

আমি অবাক হয়ে অনিকের দিকে তাকালাম, জিজ্ঞেস করলাম, "কী হচ্ছে এখানে?"

অনিক দাঁত বের করে হেসে বলল, "যে যন্ত্রটা রেখে এসেছি সেটা আসলে একটা ছোট ভিডিও ট্রান্সমিটার। সাথে আলট্রাসোনিক একটা ইন্টারফেসও আছে।"

"তার মানে?"

"তার মানে এটা যেখানে থাকবে সেটা আমরা দেখতে পাব। সেখানকার কথা শুনতে পাব!"

আমি দেখতে পেলাম বিল্লাল মাস্তান হাত বাড়িয়ে টেলিভিশনে এগিয়ে আসছে এবং হঠাৎ করে ছবি ওলটপালট হতে লাগল! অনিক দাঁত বের করে হেসে বলল, "বিল্লাল মাস্তান আমাদের ফাঁদে পা দিয়েছে।"

"মানে?"

"এখন বিল্লাল মাস্তান এই ভিডিও ট্রান্সমিটার তার ঘরে নিয়ে রাখবে। আমরা এখানে বসে দেখব ব্যাটা বদমাইশ কখন কী করে?"

আমি অনিকের দিকে তাকিয়ে বললাম, "তুমি জানতে যে বিল্লাল মাস্তান এটা নিয়ে যাবে?"

"আন্দাজ করেছিলাম।"

"এটা আসলে ইঁদুর দূর করার যন্ত্র না?"

"ইঁদুর ধরার সিগন্যালও এটা দিতে পারে তবে আসলে এটা একটা ভিডিও ট্রান্সমিটার।"

অনিক টেবিলে ছোট ছোট চৌকোনা প্লাস্টিকের কয়েকটা বাক্স দেখিয়ে বলল, "এইগুলো হচ্ছে আসল ইঁদুর দূর করার যন্ত্র। ইনফ্রাসোনিক স্পিকার।"

"তা হলে?" পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে জটিল মনে হতে থাকে, "এগুলো দিলে না কেন?"

"দিব। একটু পরে যখন শিউলি আমাদের কাছে নালিশ করতে আসবে তখন তার হাতে দিব।" অনিক টেলিভিশনের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থেকে উত্তেজিত গলায় বলল, "দেখ দেখ মজা দেখ।"

স্ক্রিনে দৃশ্যটা ওলটপালট খেতে খেতে হঠাৎ সেটা সোজা হয়ে গেল এবং আমরা বিল্লাল মাস্তানকে দেখতে পেলাম। সে ভিডিও ট্রান্সমিটারের সামনে থেকে সরে যেতেই পুরো ঘরটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঘরের এক কোনায় একজন উপুড় হয়ে ঘুমাচ্ছে, নিশ্চয়ই এটা কাদির। আমাদের ধারণা সত্যি কারণ বিল্লাল মাস্তান কাছে গিয়ে তাকে একটা লাথি মারতেই সে ধড়মড় করে উঠে বসে জিজ্ঞেস করে, "কী হল বিল্লাল ভাই?"

বিল্লাল মাস্তান আঙুল দিয়ে ভিডিও ট্রান্সমিটারটাকে দেখিয়ে বলল, "আর ইন্দুর নিয়া চিন্তা নাই। ইন্দুর দূর করার যন্ত্র নিয়া আসছি।"

"কোথা থেকে আনলেন?"

"উপর তলার বুড়িরে দুই বেকুব দিয়ে গেছে।"

আমি অনিকের দিকে তাকিয়ে বললাম, "দেখেছ কত বড় সাহস? আমাদের বেকুব বলে?"

"বলতে দাও। দেখা যাক কে বেকুব। আমরা না তারা!"

আমরা দেখলাম বিল্লাল মাস্তান সোফায় বসে সোফার নিচে থেকে একটা বোতল বের করে সেটা ঢক ঢক করে খেতে থাকে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী খাচ্ছে?"

"ফেনসিডিল।"

"কত বড় বদমাইশ দেখেছ?"

"হ্যাঁ।"

"এখন পুলিশকে খবর দিলে কেমন হয়?"

অনিক বলল, "এত তাড়াহুড়া কিসের? দেখি শেষ পর্যন্ত কী হয়!"

টেলিভিশন স্ক্রিনে আমরা দুই মাস্তানের দিকে তাকিয়ে রইলাম। বিল্লাল কান চুলকাতে চুলকাতে বলল, "এই বুড়ি খুব তাড়াতাড়ি মরবে বলে তো মনে হয় না।"

কাদির বলল, "সিঁড়ির ওপর থেকে ধাক্কা দিয়া ফালাইয়া দেই একদিন?"

"উঁহু।" বিল্লাল আরেক ঢোক ফেনসিডিল খেয়ে বলল, "এমনভাবে মার্ডার করতে হবে যেন কেউ সন্দেহ না করে। কোনো তাড়াহুড়া নাই।"

অনিক হা হা করে হেসে বলল, "দেখেছ? আমাদের যে রকম তাড়াহুড়া নাই, তাদেরও কোনো তাড়াহুড়া নাই।"

ঠিক এরকম সময় দরজায় শব্দ হল। অনিক টেলিভিশনের ভলিউমটা কমিয়ে বলল, "নিশ্চয়ই শিউলি এসেছে।"

দরজা খুলে দেখি আসলেই তাই। আমাদের দেখে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, "সর্বনাশ হইছে চাচা—"

"কী হয়েছে?"

"নিচের তলার মাস্তান আপনার যন্ত্র জোর করে নিয়ে গেছে।"

আমি এবং অনিক অবাক এবং রাগ হবার অভিনয় করতে থাকি। শিউলি পুরো ঘটনাটা বর্ণনা করে এবং আমরা যেখানে যতটুকু দরকার সেখানে ততটুকু মাথা নাড়তে থাকি।

শিউলির কথা শেষ হবার পর অনিক বলল, "তোমার ঘাবড়ানোর কোনো কারণ নেই। আমার কাছে আরো ইঁদুর দূর করার যন্ত্র আছে।"

অনিক একটা ব্যাগে চৌকোনা প্লাস্টিকের বাক্সগুলো ভরে শিউলির হাতে দিয়ে বলল, "এগুলো সব ঘরে একটা করে রেখে দিও ইঁদুর আর আসবে না।"

শিউলি খুশি খুশি মুখে বলল, "সত্যি!"

"হ্যাঁ।" অনিক গলা নামিয়ে বলল, "সাবধান, বিল্লাল মাস্তান যেন এগুলোর খোঁজ না পায়।"

"পাবে না চাচা। আমি লুকিয়ে নিয়ে যাব।"

"গুড।" অনিক টেবিল থেকে আরেকটা প্যাকেট বের করে দিয়ে বলল, "এইটাও সাথে রাখবে।"

"এইটা কী?"

"ইঁদুরের খাবার। বাসার বাইরে যেখানে ইঁদুর থাকে সেখানে এইগুলো রাখবে।"

শিউলি বলল, "এইটা কি বিষ?"

অনিক সরাসরি উত্তর না দিয়ে বলল, "অনেকটা সে রকম। সাবধান, হাত দিয়ে ধরো না। হাতে লাগলে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলবে।"

"ঠিক আছে। আমি এখন যাই।"

"যাও শিউলি।"

শিউলি চলে যাবার পর আমি বললাম, "এইটুকুন ছোট একটা বাচ্চার হাতে ইঁদুর মারার বিষ দেওয়া কি ঠিক হল?"

অনিক আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি মোটেও ওর হাতে বিষ দেই নাই।"

"তা হলে কী দিয়েছ?"

"গ্রোথ হরমোন মেশানো খাবার!"

"মানে?"

"মানে বারো নম্বর বাসায় যত ইঁদুর আছে সেগুলিকে মোটাতাজা করছি!"

"মোটাতাজা?"

"হ্যাঁ। ইনফ্রাসোনিক বিপারের কারণে এখন বাসার ভেতরে কোনো ইঁদুর ঢুকবে না, কিন্তু সেগুলো আস্তে আস্তে খাসির মতো মোটা হবে। তারপর যখন সময় হবে তখন—"

"তখন কী?"

"তখন বিল্লাল মাস্তান আর কাদির মাস্তান বুঝবে কত ইঁদুরের দাঁতের মাঝে কত ধার!"

আমি অনিকের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকালাম। অনিক চোখ মটকে বলল, "চলো, আরো কিছুক্ষণ বিল্লাল মাস্তান আর কাদির মাস্তানের নাটক দেখি।"

আমরা গিয়ে টেলিভিশন অন করতেই দুইজনকে দেখতে পেলাম খালি গায়ে টেলিভিশনে হিন্দি সিনেমা দেখে হেসে কুটি কুটি হচ্ছে। দুইজনের হাতে ছোট ছোট দুইটা বোতল, সেটা চুমুক দিয়ে খাচ্ছে আর ঢেকুর তুলছে, কী বিচ্ছিরি একটা দৃশ্য!

কয়েকদিন পরের কথা। আমি অনিকের বাসায় গিয়েছি। দুইজনে চিপস খেতে খেতে টেলিভিশনে বিল্লাল মাস্তান আর কাদির মাস্তানের কাজ-কারবার দেখছি। এখানে যেসব জিনিস আমরা দেখতে পেয়েছি পুলিশ সেটা জানলেই একেক জনের চৌদ্দ বছর করে জেল হবার কথা। মদ গাঁজা ভাং থেকে শুরু করে হেরোইন ফেনসিডিল সবকিছু নিয়ে তাদের কাজ-কারবার। নানা রকম বেআইনি অস্ত্রপাতিও ঘরের মাঝে লুকানো থাকে। সেগুলো ব্যবহার করে কবে কোথায় কোন ছিনতাই করেছে, কোন মাস্তানি করেছে অনিক সেই সংক্রান্ত সব কথাবার্তা রেকর্ড করে ফেলেছে। বেছে বেছে সেসব জায়গা কপি করে একটা সিডি তৈরি করে পুলিশকে একটা আর খবরের কাগজের লোকদের একটা দিলেই বাছাধনদের শুধু বারোটা না, একেবারে বারো দুগুণে চব্বিশটা বেজে যাবে। কীভাবে সেটা

করা যায় আমি আর অনিক সেটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছি। এরকম সময় অনিক জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল, "ঐ যে শিউলি যাচ্ছে!"

আমি বললাম, "ডাক ওকে, একটু খোঁজখবর নেই।"

অনিক জানালা দিয়ে মাথা বের করে ডাকল, "শিউলি!"

শিউলি আমাদের দেখে দাঁত বের করে হাসতে হাসতে ছুটে এল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী খবর শিউলি?"

"ভালো।"

"কোথায় যাও?"

"বাজার করতে যাই।"

অনিক জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের বাসায় ইঁদুরের উৎপাত কমেছে?"

"জে কমেছে। বাসায় ইন্দুরের বংশই নাই।"

"তাই নাকি?"

"জে। নানু খুব খুশি। প্রত্যেকদিন আপনাদের কথা কয়।"

"কী বলেন আমাদের কথা?"

"বলেন যে যদি ইন্দুরের যন্ত্রের মতো আরেকটা যন্ত্র বানাতে পারতেন যেটা মাস্তানদের দূর করতে পারে তা হলে খুব মজা হত।"

অনিক কিছু না বলে একটু হাসল। শিউলি বলল, "নানু আপনাদের একদিন চা নাস্তা খেতে ডাকবে।"

আমি আগ্রহ নিয়ে বললাম, "ভেরি গুড। ভেরি গুড।"

অনিক বলল, "ঠিক আছে শিউলি তুমি তা হলে তোমার কাজে যাও।"

শিউলি চলে যেতে শুরু করে। অনিক পেছন থেকে বলল, "তোমাদের অন্য কোনো সমস্যা হলে আমাকে বোলো।"

"কোনো সমস্যা নাই।" শিউলি হঠাৎ দাঁড়িয়ে ইতস্তত করে বলল, "শুধু একটা সমস্যা।"

অনিক অবাক হয়ে বলল, "কী সমস্যা?"

"এখন ইন্দুরের কোনো উৎপাত নাই কিন্তু বিলাইয়ের উৎপাত বাড়ছে।"

"বিড়ালের উৎপাত বেড়েছে?"

অনিক অবাক হয়ে বলল, "বিড়াল কোথা থেকে এসেছে?"

"সেটা জানি না। তয় নানু বিড়ালরে একদম ডরায় না, সেই জন্যে নানু কিছু বলে না। উল্টা প্লেটে করে প্রত্যেক দিন খাবার দেয়।"

অনিক ভুরু কুঁচকে বলল, "কী রকম বিড়াল?"

"সেইটা দেখি নাই। রাত্রিবেলা আসে তাই দেখা যায় না।"

"রাত্রিবেলা আসে?"

"জে।"

"ডাকাডাকি করে?"

শিউলি মাথা চুলকে বলল, "জে না ডাকাডাকি করে না।"

"তা হলে কেমন করে বুঝলে এটা বিড়াল। দেখতেও পাও না ডাকও শোন না—"

"ওপর থেকে নিচে তাকালে দেখা যায়। আবছা অন্ধকারে দৌড়াদৌড়ি করে। বিলাইয়ের সাইজ।"

অনিক হঠাৎ কেমন জানি চিন্তিত হয়ে গেল। শিউলি চলে যাবার পরও সে গম্ভীর মুখে হাঁটাহাঁটি করে। আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে অনিক?"

"শুনলে না—ইঁদুরের উৎপাত কমেছে, কিন্তু বিড়ালের উৎপাত বেড়েছে।"

"বিড়ালকে যদি উৎপাত মনে না করে—"

"না-না-না" অনিক দ্রুত মাথা নাড়ে, "তুমি কিছু বুঝতে পারছ না।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কী বুঝতে পারছি না?"

"এগুলো বিড়াল না।"

"তা হলে এগুলো কী?"

"এগুলো ইঁদুর। আমার গ্রোথ হরমোন খাবার খেয়ে বড় হয়ে গেছে।"

"কত বড় হয়েছে?"

"শুনলে না শিউলি বলল, বিড়ালের সাইজ!"

আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, "একেকটা ইঁদুরের সাইজ বিড়ালের মতো? সর্বনাশ!"

"হ্যাঁ। ঠিকই বলেছ, সর্বনাশ। ডজন খানেক এই ইঁদুর যদি কাউকে ধরে তা হলে তার খবর আছে।"

আমি অনিকের দিকে তাকিয়ে বললাম, "তুমি এগুলোকে এতবড় তৈরি করেছ কেন?"

"বুঝতে পারি নাই। ভেবেছিলাম, মোটাসোটা হবে, হৃষ্টপুষ্ট হবে। বড় হবে বুঝতে পারি নাই।"

"এখন?"

অনিক মাথা চুলকিয়ে বলল, "আগে দেখতে হবে নিজের চোখে।"

"কীভাবে দেখবে? অন্ধকার না হলে বের হবে না।"

"অন্ধকারে দেখার স্পেশাল চশমা আছে, নাইট ভিশন গগলস। সেগুলো চোখে দিয়ে দেখা যেতে পারে।"

আমি খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললাম, "এক কাজ করলে কেমন হয়?"

"কী কাজ?"

"বিল্লাল মাস্তান আর কাদির মাস্তানের ঘরে কিছু এসে হাজির হলে আমরা সেটা দেখতে পাই।"

"হ্যাঁ।"

"ওদের ঘরের সেই যন্ত্রটায় ইঁদুর দূর করার শব্দটা বন্ধ করে দাও। তা হলে হয়তো এক দুইটা ভিতরে ঢুকবে, আমরা তখন দেখতে পাব।"

অনিক হাতে কিল দিয়ে বলল, "গ্রেট আইডিয়া। সত্যি কথা বলতে কি আমরা আরো একটা কাজ করতে পারি।"

"কী কাজ?"

"ইঁদুরকে ঘরে ঢোকার জন্য স্পেশাল সাউন্ড দিতে পারি।"

"আছে সে রকম শব্দ?"

"হ্যাঁ, আছে। ইঁদুরের সঙ্গীত বলতে পার।"

"সঙ্গীত? ব্যান্ড সঙ্গীত?"

"ব্যান্ড সঙ্গীত না উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সেটা জানি না, কিন্তু ইঁদুরেরা এই শব্দ শুনতে পছন্দ করে। শব্দ শুনলে কাছে এগিয়ে যায়।"

আমি বললাম, "লাগাও দেখি।"

অনিক তার যন্ত্রপাতির প্যানেলে চোখ বুলিয়ে কয়েকটা সুইচ অন করে, কয়েকটা অফ করে। বড় বড় কয়েকটা নব ঘুরিয়ে কিছু একটা দেখে বলল, "এখন ইঁদুরদের ঘরের ভেতরে আসার কথা!"

"ইঁদুরের সঙ্গীত লাগিয়ে দিয়েছ?"

"হ্যাঁ, দিয়েছি। তবে ইঁদুর আসবে কিনা জানি না। হাজার হলেও দিনের বেলা, দিনের বেলা ইঁদুর গর্ত থেকে বের হতে চায় না।"

আমরা বেশ কিছুক্ষণ বসে যখন প্রায় হাল ছেড়ে দিচ্ছিলাম তখন দেখতে পেলাম মোটাসোটা একটা ইঁদুর গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে আসছে। টেলিভিশনের স্ক্রিনে ঠিক কত বড় বোঝা যায় না, কিন্তু তারপরেও আমরা অনুমান করে হতবাক হয়ে গেলাম। সেগুলো কমপক্ষে এক হাত লম্বা—লেজ নিয়ে প্রায় দুই হাত। ওজন পাঁচ কেজির কম না। এই বিশাল ইঁদুর ঘরের ভিতরে হাঁটতে লাগল। ঘরের ভিতর জিনিসপত্র শুঁকতে লাগল।

আমি কিছুক্ষণ নিশ্বাস বন্ধ করে বুক থেকে একটা লম্বা শ্বাস বের করে বললাম, "সর্বনাশ! এ যে রাক্ষুসে ইঁদুর!"

"হ্যাঁ।" অনিক মাথা নাড়ল।

"ইঁদুর বলে ইঁদুর—একেবারে মেগা ইঁদুর।"

"ঠিকই বলেছ।" অনিক মাথা নাড়ল, "একেবারে মেগা ইঁদুর।"

কিছুক্ষণের মাঝেই আরো কয়েকটা মেগা ইঁদুর ঘরের ভেতর এসে ঢুকল। বিল্লাল আর কাদির এমনিতেই খবিশ ধরনের মানুষ। ঘরের ভেতর উচ্ছিষ্ট খাবার থেকে শুরু করে নানা কিছু ছড়ানো ছিটানো রয়েছে। বিশাল বিশাল ইঁদুরগুলো সেগুলো খেতে লাগল, দাঁত দিয়ে কাটাকাটি করতে লাগল। ঘরের ভেতর এই বিশাল ইঁদুরগুলো কিলবিল কিলবিল করে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ঘরের যাবতীয় জিনিসপত্র দাঁত দিয়ে কেটে কিছুক্ষণের মাঝে সবকিছু তছনছ করে দিল।

বিল্লাল মাস্তান আর কাদির মাস্তান যখন তাদের বাসায় ফিরে এসেছে তখন রাত প্রায় দশটা। তালা খুলে ভিতরে ঢোকার শব্দ পেয়েই ইঁদুরগুলি সোফার নিচে, খাটের তলায়, দরজার কোনায় লুকিয়ে গেল। বিল্লাল আর কাদির ভিতরে ঢুকেই ইতস্তত তাকায়, তাদের চোখে প্রথমে বিস্ময় তারপর ক্রোধের ছায়া পড়ল। বিশাল মেগা ইঁদুরগুলো ঘরটা তছনছ করে রেখেছে।

বিল্লাল বলল, "কে ঢুকেছে ঘরে?"

কাদির বলল, "আমি জানি না।"

"ঘরটার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে—"

কাদির মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ। আর কী রকম একটা আঁশটে গন্ধ দেখেছ?"

বিল্লাল ইঁদুরে কেটে কুটিকুটি করে রাখা তার একটা শার্ট তুলে হুংকার দিয়ে বলল, "আমার শার্টটা কে কেটেছে?"

কাদির তার প্যান্টটার হাত দিয়ে বলল, "আমার প্যান্ট।"

বিল্লাল বলল, "আমার বালিশ।"

কাদির বলল, "আমার সোফা।"

বিল্লাল হঠাৎ শার্টের নিচে হাত দিয়ে একটা রিভলবার বের করল। সেটা হাতে নিয়ে বলল, "যেই ঢুকে থাকুক, সে এই ঘরে আছে।"

কাদিরও একটা কিরিচ হাতে নেয়। বলে, "ঠিকই বলেছেন বিল্লাল ভাই, দরজা বন্ধ ছিল। ভিতরেই আছে।"

দুইজন তখন ঘরের ভিতর খুঁজতে থাকে। খুব বেশি সময় খুঁজতে হল না। বিছানার নিচে উঁকি দিয়েই বিল্লাল একটা গগনবিদারী চিৎকার দেয়। তারপর যা একটা ব্যাপার শুরু হল সেটা বলার মতো নয়। ইঁদুরগুলো একসাথে বিল্লাল আর কাদিরের ওপর লাফিয়ে পড়ল। ভয়ে আতঙ্কে বিল্লাল দুই একটা গুলি করে কিন্তু তাতে অবস্থা আরো খারাপ হয়ে যায়। ভিতরে ইঁদুরের সাথে মাস্তানদের একটা ভয়ংকর খণ্ডযুদ্ধ শুরু হতে থাকে! দুইজন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গড়াগড়ি খায় আর বিশাল বিশাল লোমশ ইঁদুর তাদেরকে কামড়াতে থাকে। দেখে মনে হয় কিছুক্ষণের মাঝে দুজনকেই খেয়ে ফেলবে।

অনিক বলল, "সর্বনাশ!"

আমি বললাম, "তাড়াতাড়ি তোমার সুইচ অন করে ইঁদুর তাড়িয়ে দাও!"

অনিক দৌড়াদৌড়ি করে সুইচ অন করার চেষ্টা করে। সুইচ খুঁজে বের করে সেগুলো অন অফ করে নব ঘুরিয়ে যখন ইঁদুরগুলোকে দূর করল ততক্ষণে দুইজনের অবস্থা শোচনীয়। তাদের হইচই চিৎকার শুনে বাইরে মানুষজন দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকতে শুরু করেছে। তার ভিতরে কয়েকজন পুলিশকেও দেখতে পেলাম।

অনিক বলল, "চলো। সরজমিনে দেখে আসি।"

আমি বললাম, "চলো।"

আমরা যখন গিয়েছি তখন পুলিশ দুইজনকে হ্যান্ডকাফ লাগাচ্ছে। ঘরের ভেতরে কয়েক শ ফেনসিডিলের বোতল, মদ, গাঁজা, হেরোইনের সাপ্লাই। নানারকম অস্ত্র গোলাগুলি—হাতেনাতে এরকম মাস্তানদের ধরা সোজা কথা নয়। বিল্লাল আর কাদিরকে চেনা যায় না—সারা শরীর কেটেকুটে রক্তাক্ত অবস্থা।

পুলিশের একজন জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে? তোমাদের এই অবস্থা কেন?"

বিল্লাল ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলল, "এই এত বড় বড়—"

"এত বড় বড় কী?"

"ইঁদুরের মতো—"

পুলিশ অফিসার হা হা করে হাসলেন। বললেন, "এত বড় কখনো ইঁদুর হয় নাকি?"

উপস্থিত মানুষদের একজন বলল, "মদ গাঁজা খেয়ে কী দেখতে কী দেখেছে!"

"নিজেরাই নিজের সাথে মারামারি করেছে।"

কাদির মাথা নেড়ে বলল, "জি না! আমরা মারামারি করি নাই।"

পুলিশ অফিসার দুইজনকে গাড়িতে তুলতে তুলতে বলল, "রিমান্ডে নিয়ে একটা রগড়া দিলেই সব খবর বের হবে।"

সব লোকজন চলে যাবার পর শিউলি আমাদের কাছে এসে দাঁড়ায়। দাঁত বের করে হেসে বলল, "এক নম্বুরি কাজ!"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কী কাজ এক নম্বুরি?"

"এই যে মাস্তানদের দূর করলেন?"

"কে দূর করেছে?"

"আপনারা দুইজন।"

অনিক অবাক হয়ে বলল, "তুমি কেমন করে জান?"

শিউলি খুক খুক করে হাসতে হাসতে বলল, "আমি সব জানি। খালি একটা কথা—"

"কী কথা?

"বিলাইয়ের সাইজের ইন্দুরগুলো কিন্তু দূর করতে হবে।"

অনিক হাসল। বলল, "মাস্তান দূর করে দিতে যখন পেরেছি—তখন তোমার এই ইঁদুরও দূর করে দেব।"

শিউলি তার সব কয়টি দাঁত বের করে বলল, "এই জন্যেই তো আপনাদের ইন্দুরওয়ালা ডাকি!"